

ইতিমধ্যে

সম্পাদকমহাশয়েরা মধ্যমধ্যে লেখকদের 'ইতিমধ্যে' একটা কিছু লিখে দিতে আদেশ করেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কি লিখব?— তার উত্তরে বলেন, যাহোক-একটা-কিছু লেখো। কি যে লেখো তাতে কিছু আসে-যায় না— কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লেখাটা 'ইতিমধ্যে' হওয়া চাই। এস্থলে ইতিমধ্যে'র অর্থ হচ্ছে আগামী সংখ্যার কাগজ বেরবার পূর্বে। সম্পাদকমহাশয়েরা যখন আমাদের এইভাবে সাহিত্যের মাঙ্কাবার তৈরি করতে আদেশ দেন, তখন তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্যে যারা পাকা, অঙ্গে তারা স্বভাবতই কাচা।

দিন গুণে কাজ করবার প্রবৃত্তিটি আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। কোন্ দিনে কোন্ ক্ষণে কোন্ কার্য আরম্ভ করতে হবে, সেবিষয়ে এদেশের খুব বাধাবাধি নিয়ম ছিল; কিন্তু আরম্ভ কর্ম কখন যে শেষ করতে হবে, সেসম্বন্ধে কোনোই নিয়ম ছিল না। সেকালে কোনো জিনিস যে তামাদি হত, তার প্রমাণ সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সেই কারণেই বোধ হয়, বহু মনোভাব ও আচারব্যবহার, যা বহুকাল পূর্বে তামাদি হওয়া উচিত ছিল, হিন্দুসমাজের উপর আজও তাদের দাবি পুরোমাত্রায় রয়েছে। সে যাই হোক, কাজের ওজনের সঙ্গে সময়ের মাপের যে একটি সম্বন্ধ থাকা উচিত— এ জ্ঞান আমাদের ছিল না। 'কালোহয়ং নিরবধি'— এ কথা সত্য হলেও সেই কালকে মানুষের কর্মজীবনের উপযোগী করে নিতে হলে তার যে ঘর কেটে নেওয়া আবশ্যিক— এই সহজ সত্যটি আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর একটি বিশেষ কাজ শেষ করতে হলে প্রথমে কোথায় দাঁড়ি টানতে হবে, সেটি জানা চাই; তার পরে কোথায় কমা ও কোথায় সেমিকোলন দিতে হবে, তারও হিসেব থাকা চাই। এককথায়, সময়-পদার্থটিকে punctuate করতে না শিখলে punctual হওয়া যায় না। সুতরাং আমরাও যে ইংরেজদের মত সময়কে টুকরো করে নিতে শিখি, তাতে কাজের বিশেষ সুবিধে হবে; কিন্তু সাহিত্যের সুবিধে হবে কি না, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ সময়ের মূল্যের জ্ঞান বড় বেশি বেড়ে গেলে সেই সময়ে যা করা যায় তার মূল্যের জ্ঞান, চাই কি, আমাদের কমেও যেতে পারে। জার্মান কবি গ্যোটে বলেছেন যে, মানুষের চরিত্র গঠিত হয় কর্মের ভিতর, আর মন গঠিত হয় অবসরের ভিতর। অর্থাৎ পেশী সবল করতে হলে মানুষের পক্ষে ছোটোছোটো করা দরকার, কিন্তু মস্তিষ্ক সবল করতে হলে মাথা ঠিক রাখা দরকার, স্থির থাকা দরকার। সাহিত্য-রচনা করা হচ্ছে মস্তিষ্কের কাজ; সুতরাং 'ইতিমধ্যে' বলতে যে অবসর বোঝায়, তার ভিতর সে-

রচনা করা সম্ভব কি না— তা আপনাই বিবেচনা করবেন। তবে যদি কেউ বলেন যে, লেখার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ থাকাই চাই— এমন-কোনো নিয়ম নেই, তাহলে অবশ্য গোঁটের মতের মূল্য অনেকটা কমে আসে।

হাজার তাড়াহুড়ো করলেও লেখা-জিনিসটে যে কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, তার প্রমাণ উদাহরণের সাহায্যে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে কবিতার কথা ধরা যাক। লোকের বিশ্বাস যে, কবিতার জন্মস্থান হচ্ছে কবির হৃৎপিণ্ড। তাহলেও হৃদয়ের সঙ্গে কলমের এমন-কোনো টেলিফোনের যোগাযোগ নেই, যার দরুন হৃদয়ের তারে কোনো কথা ধ্বনিত হওয়ামাত্র কলমের মুখে তা প্রতিধ্বনিত হবে। আমার বিশ্বাস যে, যে-ভাব হৃদয়ে ফোটে, তাকে মস্তিষ্কের বক-যন্ত্রে না চুঁইয়ে নিলে কলমের মুখ দিয়ে তা ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে পড়ে না। কলমের মুখ দিয়ে অনায়াসে মুক্ত হয় শুধু কালি, সাত রাজার ধন কালো মানিক নয়। অতএব কবিতা রচনা করতেও সময় চাই। তার পর ছোটগল্প। মাসিকপত্রের উপযোগী গল্প লিখতে হলে প্রথমে কোনো-না-কোনো ইংরেজি বই কিংবা মাসিকপত্র পড়া চাই। তার পর সেই পঠিত গল্পকে বাংলায় গঠিত করতে হলে তাকে রূপান্তরিত ও ভাষান্তরিত করা চাই। এর জন্তে বোধ হয় মূলগল্প লেখবার চাইতেও বেশি সময়ের আবশ্যক।

কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে যা-খুশি-তাই লেখবার একটা সুবিধে ছিল। ‘একালে এদেশে কিছুই নেই, অতএব সেকালে এদেশে সব ছিল’— এইকথাটা নানারকম ভাষায় ফলিয়ে-ফেনিয়ে লিখলে সমাজে তা ইতিহাস বলে গ্রাহ্য হত। কিন্তু স্বেচ্ছায়োগ আমরা হারিয়েছি। একালে ইতিহাস কিংবা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখতে হলে তার জন্ত এক-লাইব্রেরি বই পড়াও যথেষ্ট নয়। প্রত্নতত্ত্ব এখন মাটি খুঁড়ে বার করতে হয়, স্মরণঃ ‘ইতিমধ্যে’, অর্থাৎ সম্পাদকীয় আদেশের তারিখ এবং সামনে-মাসের পয়লার মধ্যে, সে কাজ করা যায় না। অবশ্য ম্যালেরিয়ার বিষয় কিছুই না জেনে অনেক কথা লেখা যায়; কিন্তু সে লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যার একপাশে ভ্রমরগুঞ্জন আর অপরপাশে মধু, তাই আমরা সাহিত্য বলে স্বীকার করি। দুঃখের বিষয়, ম্যালেরিয়ার একপাশে মশকগুঞ্জন আর অপরপাশে কুইনিন। স্মরণঃ সাহিত্যেও ম্যালেরিয়া হতে দূরে থাকাই শ্রেয়। বিনা চিন্তায়, বিনা পরিশ্রমে, আজকাল শুধু দুটি বিষয়ের আলোচনা করা চলে; এক হচ্ছে উন্নতিশীল রাজনীতি, আর-এক হচ্ছে স্থিতিশীল সমাজনীতি। কিন্তু এ দুটি বিষয়ের আলোচনা সচরাচর সভাসমিতিতেই হয়ে থাকে। অতএব ও দুই হচ্ছে বক্তাদের একচেটে। লেখকেরা যদি বক্তাদের অধিকারের উপর

হস্তক্ষেপ করেন, তাহলে বক্তারাজ লিখতে শুরু করবেন, এবং সেটা উচিত কাজ হবে না।

লেখবার নানারূপ বিষয় এইভাবে ক্রমে বাদ পড়ে গেলে শেষে একটিমাত্র জিনিসে গিয়ে ঠেকে, যার বিষয় নির্ভাবনায় অনর্গল লেখনী চালনা করা চলে, এবং সে হচ্ছে নীতি। নীতির মোটা আদেশ ও উপদেশগুলি সংখ্যায় এত কম যে, তা আঙুলে গোনা যায়, এবং সেগুলি এতই সর্বলোকবিদিত ও সর্ববাদিসম্মত যে, স্তম্ভশরীরে স্বচ্ছন্দচিত্তে সেবিষয়ে এক-গঙ্গা লিখে যাওয়া যায়; কেননা, কেউ যে তার প্রতিবাদ করবে, সে ভয় নেই।

মানুষ যে দেবতা নয়, এবং মানবের পক্ষে দেবত্বলাভের চেষ্টা নিত্য ব্যর্থ হলেও যে নিয়ত কর্তব্য, সেবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তবুও অপরকে নীতির উপদেশ দিতে আমার তাদৃশ উৎসাহ হয় না। তার কারণ, মানুষ খারাপ বলে আমি দুঃখ করি নে, কিন্তু মানুষ দুঃখী বলে মন খারাপ করি। অথচ মানুষের দুর্গতির চাইতে দুর্নীতিটি বেশি চোখে না পড়লে নীতির গুরুগরি করা চলে না।

তাছাড়া পরের কানে নীতির মন্ত্র দেওয়া সম্বন্ধে আমার মনে একটি সহজ অপ্রবৃত্তি আছে। যেকথা সকলে জানে, সেকথা যে আমি না বললে দেশের দৈন্য ঘুচবে না, এমন বিশ্বাস আমি মনে পোষণ করতে পারি নে। এমনকি আমার এ সন্দেহও আছে যে, যারা দিন নেই রাত নেই অপরকে লক্ষ্মীছেলে হতে বলেন, তাঁরা নিজে চান শুধু লক্ষ্মীমন্ত হতে। যারা পরকে বলেন 'তোমরা ভালো হও, ভালো কর', তাঁরা নিজেকে বলেন 'ভালো খাও, ভালো পর'। সুতরাং আমার পরামর্শ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি তাঁকে বলব 'ভালো খাও, ভালো পর'। কারণ মানুষ পৃথিবীতে কেন আসে কেন যায়, সে রহস্য আমরা না জানলেও এটি জানি যে 'ইতিমধ্যে' তার পক্ষে খাওয়া-পরাটা দরকার।

'তোমরা ভালো খাও, ভালো পর', এ পরামর্শ সমাজকে দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন; কেননা, ও-কথার ভিতর এইকথাটি উছ থেকে যায় যে, পরামর্শদাতাকে নিজে ভালো হতে হবে এবং ভালো করতে হবে। আপত্তি তো এখানেই।

যিনি ভালো খান ও ভালো পরেন, সহজেই তাঁর মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশ্বাস জন্মে যায়, এবং সেইসঙ্গে এই ধারণাও তাঁর মনে দৃঢ় হয়ে ওঠে যে, যেখানে দৈন্য সেইখানেই পাপ।

দারিদ্র্যের মূল যে দারিদ্র্যের দুর্নীতি, এই ধারণা একসময়ে ইউরোপের ধনীলোকের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে, এই ভুলের উপর 'পোলিটিকাল ইকনমি'-নামে

একটি উপবিজ্ঞান বেজায় মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। অর্থ যে ধর্মমূলক, এর প্রমাণ পৃথিবীতে এতই কম যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা একটি পূর্বজন্ম কল্পনা ক'রে সেই পূর্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ সমাজকে মেনে নিতে শিখিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যার চাতুর্যে জিৎ অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষদেরই, কারণ বহু লোকের দুঃখকষ্ট যে তাদের ইহজন্মের কর্মফলে নয়, তা প্রমাণ করা যেতে পারে; কিন্তু সে যে পূর্বজন্মের কর্মফলে নয়, তা এ জন্মে অপ্রমাণ করা যেতে পারে না।

আসলে দুইজনের মুখে একই কথা। সে হচ্ছে এই যে, পরের দুঃখ যখন তাদের নিজের দোষে, তখন তাদের শুধু ভালো হতে শেখাও, তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য নয়। অতএব মানুষের দুর্গতির প্রতি করুণ হওয়া উচিত নয়, তাদের দুর্নীতির প্রতি কঠোর হওয়াই কর্তব্য।

কিন্তু আজকাল কালের গুণে শিক্ষার গুণে আমরা পরের দুঃখ সম্বন্ধে অতটা উদাসীন হতে পারি নে, কর্মফলে আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নে। তাই দীনকে নীতিকথা শোনানো অনেকে হীনতার পরিচায়ক মনে করেন। ছোট্টছেলে সম্বন্ধে 'পড়লে-শুনলে দুধু-ভাতু', এ সত্যের পরিবর্তে 'আগে দুধভাত, পরে পড়াশুনো', এই সত্যের প্রচার করতে চাই। এদেশের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের জন্ত আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করবার পূর্বে অন্তের ব্যবস্থা করা শ্রেয় মনে করি। আগে অন্তপ্রাশন, পরে বিচারস্তু—সংস্কারেও এই সনাতন ব্যবস্থা বজায় রাখা আমাদের মধ্যে সংগত। অথচ আমরা যে কেন ঠিক উলটো পদ্ধতির পক্ষপাতী, তার অবশ্য কারণ আছে।

... লোকশিক্ষার নামে যে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি, তার প্রথম কারণ যে আমরা শিক্ষিত। স্কুলে লিখে এসে যে-কালি আমরা হাত আর মুখে মেখেছি, তার ভাগ আমরা দেশসুদ্ধ লোককে দিতে চাই। যেমনি একজনে লোকশিক্ষার স্বর ধরেন অমনি আমরা যে তার ধুষো ধরি, তার আর-একটি কারণ এই যে, এ কাজে আমাদের শুধু বাক্যব্যয় করতে হয়, অর্থব্যয় করতে হয় না। এ ব্যাপারে লাগে লাখ টাকা দেবে গৌড়সরকার।

জনসাধারণের হাতে-খড়ি দেবার পরিবর্তে মুখে-ভাত দেবার প্রস্তাবে আমরা যে তেমন গা করি নে তার কারণ, সাংসারিক হিসাবে সকলের স্বার্থসাধন করতে গেলে নিজের স্বার্থ কিঞ্চিৎ খর্ব করা চাই; ত্যাগস্বীকারের জন্ত নীতি নিজে শেখা দরকার, পরকে শেখানো দরকার নয়।

আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ যে সমগ্র জাতির স্বার্থের সহিত জড়িত, এ জ্ঞান যে আমাদের হয়েছে তার প্রমাণ বাংলাসাহিত্যের কতকগুলি নতুন কথায় পাওয়া

যায়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা, জাতীয় আত্মজ্ঞানের কথা, আজকাল বক্তাদের ও লেখকদের প্রধান সম্বল। অথচ একথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, এত বলা-কওয়া সত্ত্বেও এই অঙ্গাঙ্গী ভাব পরস্পরের গলাগলি ভাবে পরিণত হয় নি; আর জাতীয় আত্মজ্ঞান শুধু জাতীয় অহংকারে পরিণত হচ্ছে, যদিচ অহংজ্ঞানই আত্মজ্ঞানের প্রধান শত্রু। জাতীয় কর্তব্যবুদ্ধি অনেকের মনে জাগ্রত হলেও জাতীয় কর্তব্য যে সকলে করেন না, তার কারণ, পরের জন্ত কিছু করবার দিন আমরা নিত্যই পিছিয়ে দিই। আমাদের অনেকের চেষ্টা হচ্ছে— প্রথমে নিজের জন্ত সব করা, পরে অপরের জন্ত কিছু করা। সুতরাং জাতীয় কর্তব্যটুকু আর 'ইতিমধ্যে' করা হয় না। ফলে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', এই পুরনো কথার উপর আমরা নিজের কর্মজীবন প্রতিষ্ঠা করি, আর 'জাত বাঁচলে ছেলের নাম', এইরকম একটা কোনো বিশ্বাসের বলে জাতীয় কর্তব্যের ভারটা, এখন যারা ছেলে এবং পরে যারা মানুষ হবে, তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, যা-কিছু করতে হবে, তা 'ইতিমধ্যে'ই করতে হবে। সম্পাদকমহাশয়েরা, লেখক নয়, পাঠকদের যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করাতে পারেন, তাহলে তাঁদের সকল আঙ্গা আমরা পালন করতে প্রস্তুত আছি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

বর্ষার কথা

আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আর যে বিষয়েই হোক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্ট-জিনিসটি দেশ-কালের বহিভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। হামলেট, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার জো নেই। কিন্তু সংগীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে, এদেশে আর্ট কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগরাগিণীর স্ফূর্তির ঋতু মাস দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। ঝাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্যন্ত পৌঁছয়, তিনিও জানেন যে, ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল .আর পূর্বীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিকপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরনো চাইই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়ে প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্তত জৈষ্ঠ্যমাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনের কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তাছাড়া যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষণ সক্ষম হতেন কি না, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হামলেটকে বাদ দিয়ে হামলেট-নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়ত, বর্ষার কবিতা লিখতে আমার ভরসা হয় না এই কারণে যে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর কোনো শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাংলা-কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে, একথা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পণ্ড হবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তাছাড়া, বাস্তব-জীবনে যখন আমাদের কোনো কথাই মেলে না, তখন অন্তত একটা জায়গা থাকণ চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সেদেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর-এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মত ঢুকুল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তাহলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্তঃ-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে

পাঠকে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপুর করে তুলতে হলে মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যিক। সে কবিতার সঙ্গে সততসঙ্গরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোমির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অণ্ড কোনোরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী, শুষ্কা না হলেও ক্ষীণা; দামোদর নন যে, শঙ্কর-বন্যায় বাংলার সকল ছাঁদবাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাব-বশতই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য দরশ পরশ সরস হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলানো যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই, করে বসে আছেন। আমি যদি ঐসকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তাহলে আমার চুরিবিণ্ডে ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌখবৃত্তি কি না, সেবিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্যকবিদের মতে, মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃকসম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ ওসব কথাই আর-কিছু পেটেন্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়ব—বিশেষত যখন তাদের কোনো বদলি পাওয়া যায় না। যেকথা একবার ছাপা হয়ে গেছে, তাকে আর চাপা দিয়ে রাখবার 'জো নেই'; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত করবে। নব্যকবিদের আর-একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন, তাহলে পরবর্তী কবিরা তা ব্যবহার করতেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুন সে স্বেযোগ হারিয়েছি বলে আমাদের যে চূপ করে থাকতে হবে, সাহিত্যজগতের এমন-কোনো নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য করলেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর-একটি বাধা আছে। কলম ধরলেই মনে হয়, মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা-কিছু বক্তব্য ছিল, তা কালিদাস সবই বলে গেছেন, বাকি যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এবিষয়ে একটি নূতন উপমা কিংবা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসনভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমূর্তির বর্ণনা করতে উত্তম হই, তাহলেও বড় স্তম্ভিত করতে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কর, স্পর্শ ভিজ, এবং শব্দ বেজায়। স্তম্ভিত যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে কিন্তু কবিত্ব থাকবে কি না, তা বলা কঠিন।

কবিতার যা দরকার এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেইসব আনুষঙ্গিক উপকরণও